দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 04 SEP 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম 3 ...

শিক্ষাঙ্গনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব

নাম্না মিয়া

শিক্ষাঙ্গন বলতে প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়। এই রকম প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে পাঠাগার/গ্রন্থাগার রয়েছে বা রাখা উচিৎ। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সাথে নানাবিধ শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন গ্রন্থাগার নেই বা থাকলেও গ্রান্থাগার উপকরণ বা পাঠ্য সামগ্রীর প্রচুর অভাব? বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেমিনার, অনুষদ গ্রন্থাগার ও ইনস্টিটিউশনের লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই-পুস্তক বা পাঠ্য সামগ্রী না থাকে, তাহলে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পড়তে হয় চরম বিপাকে। এর কারণ এ রকম শিক্ষাঙ্গনে পড়ানো হয় আধুনিক ও উন্নতমানের বই-পুস্তক। এসব বই-পুস্তক দেশী বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না বলেই ক্যাটালগে দেখে সরাসরি সরবরাহকারীদের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে। এতে কতটুকু সুবিধা অসুবিধা তা হয়তো সাধারণের বোধগম্য নয়। কেবল ভুক্তভোগীরাই ওয়াকিফহাল। কাজটি শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সুবিধার জন্যই করা হয় না। বরং সকলের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই প্রচেষ্টা থাকে। তবে যতটা চেষ্টা করা হয়, ততটা হয়তো সমাধান সম্ভব হয় না। কারণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশের প্রচুর সম্পদ ব্যয় করতে হয়। আর এরই বিনিময় আমরা বই পুস্তক ও পাঠ্য দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকি। একথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এখনও আমাদের দেশে ঐসব বিদেশী বইয়ের বাংলায় অনুবাদ বা প্রণয়ন পর্যাপ্ত নয়। বিদেশী বই-পুস্তকের দাম খুব বেশী। তবুও আমাদের চড়া দামেই ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে। তবে ইদানীং এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদগণ সব রকমের পাঠ্য ইংরেজী বই পুস্তক বাংলায় অনুবাদ করার প্রস্তাব রেখেছেন। আশা করা যায় যে, অচিরেই এ রকম মহৎ কাজে জ্ঞানী ও গুণী, শিক্ষক ও গবেষক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার: দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তেমন কোন গ্রন্থাগার পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পাঠ্যপুস্তক দিয়েই শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। এতে যে তারা শুধু বাহ্যিক জ্ঞান হতেই বঞ্চিত তা নয়, তাদের অধ্যয়ন অভ্যাসেরও হ্রাস পায়। এই জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় হতেই গ্রন্থাগার তৈরী করে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহজলভ্য পাঠ্য উপকরণ দিয়ে পাঠাগার ব্যবহারের অভ্যাস তৈরী করাতে হবে। কারণ প্রাথমিক স্তর থেকে শিশুদের যেভাবে গড়ে তোলা হবে, ঠিক সেভাবেই তারা আগামী দিনগুলি কাটাতে চেষ্টা করবে।

(২) মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার: বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন গ্রন্থাগার না থাকলেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোন কোনটিতে ছোটখাট গ্রন্থাগার [illegible] গ্রন্থাগারে প্রচুর বই-পুস্তক না থাকায় গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। এর ফলে শিক্ষার্থীগণ নিজ গৃহেই যতটুকু পারে পড়াশুনা করে মাত্র। বাকী মূল্যবান সময় বাইরে খেলাধুলা বা অন্য কোন নিরর্থক কাজে ব্যয় করে। এতে একদিকে যেমন কোন অভিভাবকই শিক্ষার্থীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। অন্যদিকে বাইরের গোরাফেরার অভ্যাসেই এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে থাকে। ফলে অভিভাবকগণ হতাশা ও নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। তাই এই স্তরের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন সমোজ্জ্বল করার লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের পুস্তক পাঠে উৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়।

(৩) মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার: বাংলাদেশের মহাবিদ্যালয়গুলোতে পাঠাগার বা গ্রন্থাগার আছে। তবে সেগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। কারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে পাস করে যখনই ছাত্র-ছাত্রীরা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখনই তাদেরকে দেশী-বিদেশী উন্নতমানের বই-পুস্তক পড়ানো হয়ে থাকে। কিন্তু এসব গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, পাঠ্যপুস্তক ও কর্মচারীর যথেষ্ট অভাব।

(ক) প্রথমতঃ এই পুস্তক তো প্রয়োজনমাফিক নেই। যেগুলো আছে, তা আবার কখনো কখনো আসবাবপত্রের অভাবে টেবিল-চেয়ারের উপর বা মেঝেতে তাক দিয়ে রাখা হয়। এতে অচিরেই এইসব বই-পুস্তক বিনষ্ট হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ কর্মচারীর অভাবে দেখা যায় যে, কখনো একজন শিক্ষক ও একজন মাত্র সহকারী দিয়ে কখনো বা একজন পিয়ন দিয়ে একটি গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ কাজ করানো হয়ে থাকে। এতে গ্রন্থাগারের সামগ্রীর পর্যাপ্ত যত্ন নেওয়া যায় না। সে কারণে ছাত্র-ছাত্রীদেরও গ্রন্থাগার ব্যবহারে মনোযোগ নষ্ট হয়ে থাকে। পরিবেশই মানুষকে সুন্দর করে গড়ে তোলে। একটা গ্রন্থাগারের যদি প্রচুর আসবাবপত্র থাকে এবং সুন্দরভাবে বই-পুস্তক সাজানো গুছানো থাকে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীগণ মনের আনন্দে গ্রন্থাগারে বসে কিছুক্ষণ হলেও বইপুস্তক পড়ে সময় কাটাতে পারে। এইভাবেই বিদ্যাভ্যাস গড়ে উঠে। এবং এতে গ্রন্থাগার উন্নয়নের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার: বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা অর্জন করে দেশের কল্যাণে আত্মদান করে থাকেন। এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের মূল্য বা গুরুত্ব যে কতটুকু তা লিখে হয়তো শেষ করা যাবে না। তবে বাস্তবে এটাই প্রমাণিত যে, সাধারণতঃ মানুষের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সর্বশেষ, সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গন। এখানে যারা বিদ্যার্জন করতে আসেন তারা সকলেই যে ধনী পরিবার থেকে আসেন তা কিন্তু নয়। এদের শতকরা ৭৫ ভাগই গ্রাম-গঞ্জের ক্ষুদ্র ও দরিদ্র পরিবারের সন্তান। পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ তাদের যথাসর্বস্ব বিক্রি করে ছেলেমেয়ে, ভাই-বোনদের পাঠিয়ে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে। তাদের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হয় না বিদেশী বইপুস্তক কিনে লেখাপড়া করতে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে যদি প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত সংখ্যক বইপুস্তক বা শিক্ষা উপকরণ রাখা না হয় তাহলে গরীব পরিবারবর্গের আশা-আকাংখা ধূলায় বিলিন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গ্রন্থাগারের মূল্য বা গুরুত্ব সীমাহীন। কিন্তু এখানেও রয়েছে প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক, শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র ও কর্মচারীর অভাব। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কেও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নিরাশা ব্যক্ত করতে দেখা যায়।

এমতাবস্থায়, শিক্ষাঙ্গনের গ্রন্থাগারগুলোর সার্বিক উন্নয়ন যে প্রয়োজন, তা আমাদের সকলকে ভেবে দেখা দরকার। সেই সঙ্গে বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনের গ্রন্থাগারে যে সকল বই পুস্তক বা পাঠ্য উপকরণ আছে তার সদ্ব্যবহার করা এবং গ্রান্থাগারের নিয়ম-শৃংখলা অক্ষুন্ন রেখে এর পরিবেশকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর রাখা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পরম কর্তব্য বলে মনে করি। কারণ নিজের দায়িত্ব অন্যের উপরে চাপিয়ে দিয়েই সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না। বরং শিক্ষা বিষয়ক কোন সমস্যার সমাধানে পৌছুতে হলে, শিক্ষক ও গ্রন্থাগার কর্মচারীকে আন্তরিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করা সকল ছাত্র-ছাত্রীর নৈতিক দায়িত্ব।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 04 SEP 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 3 ...

বাইরে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। যে জিনিস তৈরী করতে পারবো না সে জিনিস ভোগের অভিলাষ পরিহার করবো, এই নীতিতে স্বল্পকালের মধ্যে ভারত কীভাবে শিল্পায়িত হল তা আমাদের তলিয়ে দেখা উচিত। চরকা ও খদ্দরের সমাজদেহে স্বাদেশিকতার আধুনিক রূপায়ণ ঘটেছে ভারতের শিল্পনীতিতে। আর আমাদের স্বাদেশিকতা হল—সাত-সাগর তের-নদীর প্রবাহে সৃষ্ট একটি বারোমেসে বুলি দেশকে শিল্পায়িত করতে হলে সুষ্ঠু শিল্পনীতির আওতায় যুব সমাজের মধ্য থেকে উচ্চশিক্ষিতদেরকে এগিয়ে আনতে হবে। শিল্প বিষয়ক, প্রকল্প তৈরী, প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব সরকারকেই পালন করতে হবে। শিল্পের সঙ্গে জড়িত যারা তাদের মতে আমদানীনীতি, আমদানীকৃত কাঁচামালের ওপর আরোপিত কর, বিদ্যুতের রেট ও বিভ্রাট, শ্রমিকদেরকে নিয়ে রাজনৈতিক টানাটানি এবং উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বেতন-ভাতা চাপিয়ে দেয়ার সরকারী নীতি ইত্যাদি বাংলাদেশে শিল্প বিকাশের বিশেষ অন্তরায়। শিল্পের এই অবস্থায় যান্ত্রিক কৃষির কৌশল গ্রহণ করাও সম্ভব হচ্ছে না।

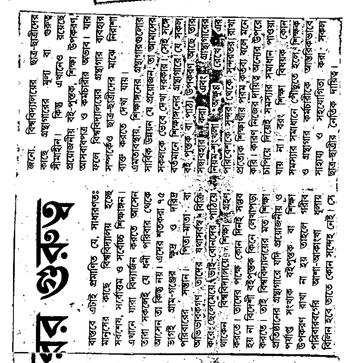

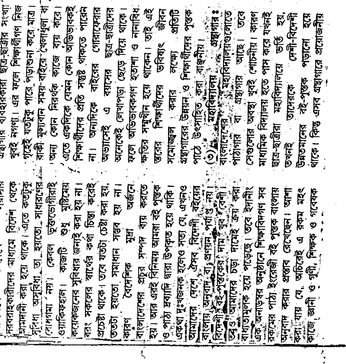

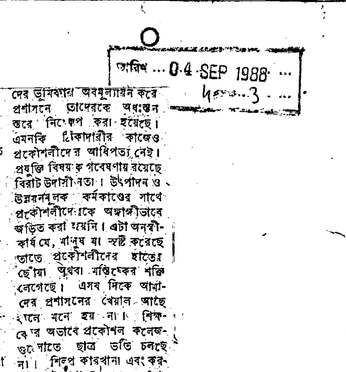

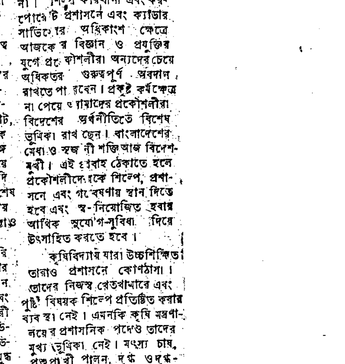

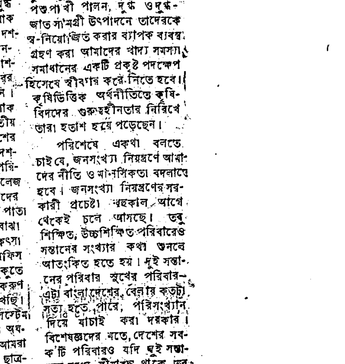

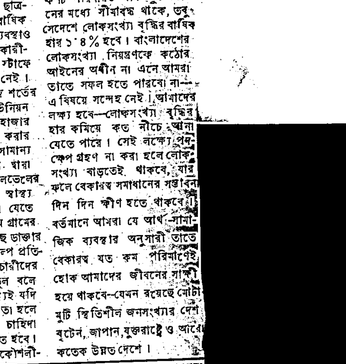

বাংলাদেশে ডাক্তাররা চাকরি পাচ্ছেন না, স্ব-নিয়োজিত হবার আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না, রাশিয়া থেকে এম, ডি এবং তারপর পিএইচ ডি ডিগ্রীধারী ডাক্তারকে নিয়ে সরকার, মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের স্নায়ুযুদ্ধ চলছে, এসব খবরে আমরা অবাক হয়েছি। দেশের শতকরা প্রায় দশজন নাগরিক শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। শতকরা পঞ্চাশজন জীবনে একবারও ডাক্তারের কাছে যাবার সুযোগ পাননি। বছরে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক অন্ধ হচ্ছেন। আমাদের জাতীয় জীবন-দীর্ঘতা এখনো চল্লিশের ধারেপাশে অর্থাৎ উন্নত দেশগুলোর অর্ধেকপ্রায়। এই পরিস্থিতিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সাধারণ রোগীদের জন্যে করিডোরে ও ওয়ার্ডে পাতা বেড-কটগুলো দেখলেই বোঝা যাবে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার নমুনা। সরকারী অফিস টাইমের বাইরের সময়টুকুতে রোগীদের অসহায়তার করুণ দৃশ্য আমরা অনেকেই দেখেছি। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের শিফট সিস্টেম নেই বলে হাসপাতালে কত অঘটন ঘটছে তার খবর আমরা রাখি না। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অন্ততঃপক্ষে বার্ষিক একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও বাংলাদেশে নেই। সরকারী-বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের স্টাফে ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা নেই। লাখ পাঁচেক টাকার সহজ শর্তের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে হাজার হাজার ডাক্তারকে স্ব-নিয়োজিত করার নীতি গ্রহণ করা হলে সামান্য সম্মানীর বদলে তাদের দ্বারা প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী লেভেলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাপনায় গ্রামের গরীব মানুষ হাতের কাছে ডাক্তার পেতে পারেন। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিক-কর্মচারীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল বলে অভিযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যই যদি সুখের মূল হয়ে থাকে তা হলে বাংলাদেশে ডাক্তারের চাহিদা এখনো অপরিসীম বলতে হবে।

দেশ গড়ার কাজে প্রকৌশলীদের ভূমিকায় অবমূল্যায়ন করে প্রশাসনে তাদেরকে অধঃস্তন স্তরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এমনকি ঠিকাদারীর কাজেও প্রকৌশলীদের আধিপত্য নেই। প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণায় রয়েছে বিরাট উদাসীনতা। উৎপাদন ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে প্রকৌশলীদেরকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত করা হয়নি। এটা অনস্বীকার্য যে, মানুষ যা সৃষ্টি করেছে তাতে প্রকৌশলীদের হাতের ছোঁয়া অথবা মস্তিষ্কের শক্তি লেগেছে। এসব দিকে আমাদের প্রশাসনের খেয়াল আছে বলে মনে হয় না। শিক্ষকের অভাবে প্রকৌশল কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তি চলছে না। শিল্প কারখানা এবং করপোরেট প্রশাসনে এবং ক্যাডার সার্ভিসের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে প্রকৌশলীরা অন্যদের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবেন। প্রকৃষ্ট কর্মক্ষেত্র না পেয়ে আমাদের প্রকৌশলীরা বিদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। বাংলাদেশের মেধা ও সৃজনী শক্তি আজ বিদেশমুখী। এই প্রবাহ ঠেকাতে হলে প্রকৌশলীদেরকে শিল্পে, প্রশাসনে এবং গবেষণায় স্থান দিতে হবে এবং স্ব-নিয়োজিত হবার আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে।

কৃষিবিদ্যায় যারা উচ্চশিক্ষিত তারাও প্রশাসনে কোণঠাসা। তাদের নিজস্ব খেতখামারে এবং পুষ্টি বিষয়ক শিল্পে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা নেই। এমনকি কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক পদেও তাদের মুখ্য ভূমিকা নেই। মৎস্য চাষ, পশুপাখী পালন, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী উৎপাদনে তাদেরকে স্ব-নিয়োজিত করার ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধানের একটি প্রকৃষ্ট পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে কৃষিবিদদের গুরুত্বহীনতার নিরিখে তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন।

পরিশেষে একথা বলতে চাই যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আমাদের নীতি ও মানসিকতা বদলাতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সরকারী প্রচেষ্টা বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছে। তবু শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত পরিবারেও সন্তানের সংখ্যার কথা শুনলে আতংকিত হতে হয়। দুই সন্তানের পরিবার সুখের পরিবার—এটা বাংলাদেশের বেলায় কতটা সত্য হতে পারে, পরিসংখ্যান দিয়ে যাচাই করা দরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের সবক'টি পরিবারও যদি দুই সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবু সেদেশে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ১.৪% হবে। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে কঠোর আইনের অধীন না এনে আমরা তাতে সফল হতে পারবো না—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের লক্ষ্য হবে—লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে কত নীচে আনা যেতে পারে। সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে লোকসংখ্যা বাড়তেই থাকবে, যার ফলে বেকারত্ব সমাধানের সম্ভাবনা দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকবে। বর্তমানে আমরা যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অনুসারী তাতে বেকারত্ব যত কম পরিমাণেই হোক আমাদের জীবনের সাথী হয়ে থাকবে—যেমন রয়েছে দেশ-মুটি স্থিতিশীল জনসংখ্যার দেশ বৃটেন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্রে ও আরো কতেক উন্নত দেশে।